কবিতা

অর্ঘ্যদীপ রায়

মৎস্যকন্যা

(১)

জলের গভীরে অপেক্ষা ছিল তার। নীল কুয়াশা , ভেজা আষাঢ়। শহর ক্রিয়াপদ হয়ে ওঠে। জলকণা স্পর্শ করে তার ছাদকে। ছাদের নীচে বন্দী মেয়েটি। দীর্ঘদিন জলে থাকতে থাকতে তার শ্যাওলা অভ্যেস। তার নোনতা গা। তার পার্শ্বরেখা জ্যামিতি। তাই, উড়ে আসা জলকণা যখন তার শার্সি স্পর্শ করে , ছুঁয়ে দেখে সে। দেখে, কোনো প্রাচীন এক নগরীর ছবি আঁকা থাকে কণার গায়ে। কণার গাঁয়ে। যেখানে ধীরগতিতে চলতো শকট। কাদার মধ্যে পেতে রাখা ইট পায়ে পায়ে এগিয়ে যেত আবালবৃদ্ধবণিতা। সাঁকো পেরোলেই বন্দীত্ব। সাঁকো পেরোলেই জলের গভীর নিঙড়ে খুঁজে পাওয়া যায় একটি অন্দরমহল। সাঁতার কেটে খাজাঞ্চিবাড়ি, ডুবসাঁতারে মোহনা। তবু সে আদিগন্ত সাম্রাজ্যের শেষ হয়না। মৎস্যরানী হামাম জুড়ে আতর সাজায়।

(২)

স্বপ্ন এলো রাতের মাঝসড়কে। দুদিকে জলরাশি আর তার মাঝে পথিক আমি। অনেক মাছ জলের গভীর থেকে লাফ দিয়ে এসে পড়ছে আমার পায়ে। আর মারা যাচ্ছে। রাস্তা জুড়ে তাদের মৃতদেহ। এভাবে এক একটি মৃতদেহ পেরিয়ে পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি আমি। অনেক ব্যর্থ ফাৎনা প্রহরের বিষণ্নতা ভুলিয়ে দিচ্ছে এ স্বপ্নটি। কাঠের জানলা আর্দ্র হয়ে যাচ্ছে বাহ্যিক মুষলধারায়। ঘুম ভেঙে গেলো। রিনরিন বৃষ্টিরাতে অকিঞ্চন ছাদ দেখতে পাচ্ছি। চুঁইয়ে পড়া জলবিন্দু জমা হচ্ছে পরিত্যক্ত হাঁড়িতে। ভেসে যাচ্ছে দালান, পূর্বপুরুষের বেঞ্চি। মনে হয় যেন কেউ ডাকছে। এই গভীর অনুষঙ্গে, এই উন্মাদ রাতের শেষ প্রহরে মনে হচ্ছে ওই দীঘির বুকে যেন কেউ অপেক্ষা করছে। এক অজানা আনন্দ, এক অচেনা ভয়। যেন সমস্ত প্রাপ্তির আশঙ্কাগুলি সত্যি হবে বলে রাত ঘনীভূত হয়ে আসছে। যেন এই দরজায় টোকা পড়বে। অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে কেউ আসবে ঘরের আশায়। কারো ঘর পাবার ইচ্ছে , আর আমি ঘরের খোঁয়ারিতে অভ্যস্ত হতে হতে জলে ভেসে যাওয়া একটি রজনীগন্ধা মালাকে বাতিল করি স্থাবর ভালোবাসার তালিকা থেকে।

(৩)

একদিন বিকেল বিকেল ছিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। অদূরেই দীঘি, মাছেদের সূতিকাগৃহ। ‘চোখ গেলো’ পাখি ডাকছিলো খুব। নিদাঘ এমন। মাছের দেখা নেই। যেন সব জলচর জীবই এমন চক্ষুষ্মান হয়ে গেছে যে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে এই বাস্তুতান্ত্রিক জোকারটিকে নিয়ে। খেজুর গাছের শোয়ানো গায়ে কেউ লিখে গেছে ‘A +S’। ভাবতে বসলাম, এ পাড়ায় কোন পায়রার ডানা গজালো, কোন কলাপিনীর শ্রাবণ পেলো।

কিন্তু মাছের দেখা নেই। বেলা পড়ে আসছে। চোখের সামনে আরো দু একজন দু এক পিস মাগুর নিয়ে ফেরত গেলো। একটু দূরেই শ্মশান। বলা যায় না, অবেলায় কারো আবার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হলো না তো। ফিরতে হবে।

কাল খুব ভোরে উঠে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে বাজারের উদ্দেশ্যে। এদিকে মাছের দেখা নেই। যা আছে কপালে এই ভেবে আরো কিছুক্ষন ঠায় বসে থাকলাম। ভাবলাম, বলা যায় না সন্ধ্যে হলে হয়তো মাছেরাও দু এক গুলি ভাঙ টাঙ খেয়ে টপাটপ ধরা দেবে। কিন্তু নাহ, আজ ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়। ঝিঁঝিঁর ডাক ঘনতর হচ্ছে। দেওয়ালে আয়তঘনাকার মাটির খোপে রাখা কাঁসর ঘন্টার আওয়াজ আসছিলো দূর থেকে , তাও ফিকে হয়ে এলো। এবার সোনামুগ ডালের সুবাস আসবে কি জনান্তিকে? এসব ভাবতে ভাবতে ফেরার প্রস্তুতি নিলাম।

দীঘি থেকে উঠেই প্রপিতামহের স্মৃতিমন্দিরে একটা প্রণাম ঠুকে ফিরছি , মনে হলো কেউ ডাকলো। অদ্ভুত সে আওয়াজ। জলীয়। যেন জলের গভীর থেকে এক অস্ফুট শিশু প্রথম শব্দ উচ্চারণ করলো। যদিও কিছু দেখতে পেলাম না। ফিরছি , যদিও প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে কিছু একটা রহস্য। মনে হচ্ছে সামনে চড়াই। আর তারই নয়ানজুলি দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটি বিস্রস্ত সময়। বয়ে যাচ্ছে কিছু মানুষের প্রত্যঙ্গ। আর অনেকগুলো মাছ লাফাতে লাফাতে টুপটাপ করে গিলে নিচ্ছে সেই প্রত্যঙ্গগুলো। চড়াই শেষ হলো একসময়। দেখলাম, একটি শিশু হামাগুড়ি দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছে মাটিতে শুইয়ে রাখা একটা বড়ো কাঁঠালের দিকে। বুঝলাম , জলসাম্রাজ্য ছেড়ে এসেছি , এবার একভাগ স্থলে কোনোমতে চাদর পাতা যাবে চাঁদের নিচে। ঘুম এসে যাবে ঠিকই, কোনো শৌভিকের হাতে সম্মোহিত এক এণাক্ষীর চেতনার দিকচক্রবালে ক্রমশঃ ঢলে পড়ার মতো।

(৪)

সেদিন রাতে স্বপ্ন এলো প্রদোষের কপালে। সুপ্তোত্থিত চেতনা ভেসে ছিল লালন বাতাসে। জীবন্মৃত আশাগুলি হেসেছিলো চিকীর্ষার কথা শুনে। প্লাবন- নারী দেখা দিলো চতুর্ভুজ আঙিনাতে। তার আর্দ্র মণিবন্ধে আঁকা ছিল বৃশ্চিক উল্কি। হরিৎ চুলে সাজানো ছিল অক্ষৌহিণী মায়া কবেকার। যেন উপুর্যুপরি ভালোবাসায় অবগাহন করতে করতে ভুলে গেছে সে শ্রোণী পাখনার কথা। আর হাজার নিশিপদ্ম নিয়ে বসে আছে কখন একটি আধার খুঁজে পায়।

সে এলো স্বপ্নে। যেন তিমির গায়ে মেখে তস্কর এলো অসহিষ্ণু যক্ষের উপঢৌকন নিতে। যেন রাত্রি পেরিয়ে যাচ্ছে, আর তৃণাঙ্কুরে জন্ম নিলো পৃথিবীর প্রথম এমিবাটি। যেন বাঁশির রোগা ফুঁতে মাছির স্বর্গলাভ হলো। যেন কেউ এসেছে, তবু তার ছায়া হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না। সে এলো, অথবা তুমি এলে। নীল জানালাতে শুকোতে দিয়েছিলে আঁশ তোমার। রাত গভীর হলে, সেগুলো পরে নিচ্ছ অলঙ্কারের মতো। আর চাঁদের আলোয় অলোকসামান্যা হয়ে উঠেছ তুমি। তোমার আনত চিবুক স্পর্শ করে যাচ্ছে বহুদিনের বাসি দখিনারা। তুমি মুগ্ধ হচ্ছ। তোমার এতো জীবন খুঁজে পেয়ে মরে যেতে ইচ্ছে করছে। মৃত্যুর মতো গভীর কিছু নেই , অথচ সে অসূর্যম্পশ্যা। জরায় নিমজ্জিত হতে হতে তার একদিন নিয়ম ভাঙার ইচ্ছে হয়। রোদসী দেখে, আহা, কি দারুণ নাকে তুলো গুঁজে মানুষ চলে যায় মহাপ্রস্থানে।

অথচ, রাত্রি যখন শেষ হতে চায়, তোমার ফুলকার লাল রঙে দ্রবীভূত হয়ে আসি। ভাবি, এখনো জীবন অনেক বাকি। ভাবি, এখনো জ্বর গায়ে ঘুম ভাঙলে দেখবো তুমি তাকিয়ে আছো অশ্রুসিক্ত চোখে। সে চোখের পল্লব ছিল না। অথচ পল্লবগ্রাহিতা পেয়ে বসেছে আমায়। ভোরের ফুলের নাম জানি না। শিরিষ গাছের প্রতিশব্দ জানি না। শুধু আশা রাখি, একটি রাতের স্বপ্নে জন্ম নেওয়া মীনকন্যা, এ পার্থিব কাজলটুকু মেখে নিও অপাঙ্গে, যদি সুখকর হয়ে উঠে জলের দিনগুলি। যদি অগ্ন্যুৎপাতের পরেও মনে থাকে তোমার অনামিকার স্পর্শখানি।

(৫)

অবধারিত কাব্যের মতো অহন এলো চোখে। স্বপ্নঘোর মুছে উঠে বসি, দেখি উষ্ণীষ পরে বসে আছে শালিখ পাখি। দেখি আলনা জুড়ে দোল খাচ্ছে ঘর্মাক্ত জামা চিরহরিৎ সমীরণে। স্বপ্ন গেলেও রয়ে গেলো তার অধঃক্ষেপ, মনে। যেন বর্ষার প্রথম পানি সম্ভাবনা তৈরী করে গেলো মহীরুহের। স্বপ্ন আবছা, তার ছেঁড়া ছেঁড়া মুখগুলি জুড়ে জুড়ে কোনো মানবীর বোধন হলো এই বীতশোক সকালে। বেরোলাম সাইকেল নিয়ে বাজারের উদ্দেশ্যে। পেছনে বাঁধা মাছের হাঁড়ি, যেন এক অজানা সঞ্জীবনীতে বুঁদ হয়ে আছে তার কুশীলবেরা। ভোরের শিউলি মাড়িয়ে গেলো চাকা, রেখে গেলো রেখাগুলি ঋতির। কেউ আসে মৃদু পায়ে মাথার ভেতর। কেউ আসে, অবয়ব বিমূর্ত তবু, যাতায়াত লেখা থাকে কপোল জুড়ে। বলিরেখা কমে আসে নিবিড় শীতে। জনান্তিকের স্মৃতিগুলি নিমেষেই প্রশমিত হলো মানবিক স্নেহে। জিওল পাড়ায় বিঁধে গেলো কাঁটা কারো নাবালক আঙুলে। কেউ দরদাম করে নিয়ে নিলো ব্রাত্যজন তিতপুঁটিদের। কেউ অভিযোগ করলো, কানকোর ফিকে রঙ নেহাতই কাকতালীয় নয়। তবু এভাবেই কেটে যেতো হাটের দিনগুলি। বিকেলের বাসি বৈতাল কিনে পাড়ি দিলাম নিজ নিকেতনে।

গোধূলি হচ্ছে সাইকেলের চেইন পড়ে যাবার মতো। শূন্যতা জেগে থাকছে চায়ের কাপের নিচে পড়ে থাকা চিনির দানার মতো। তবু সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলবে ওই ঘরটিতে, ভেসে আসবে গোমূত্রের গন্ধ প্রতিবেশী গোয়ালঘর থেকে। সাইকেলের বেলের আওয়াজ শুনে মার্বেল খেলায় ব্যস্ত শিশুগুলি রাস্তা ছেড়ে দেবে। আর এই আটপৌরে ঘর, যা কিনা হঠাৎই হারেম হয়ে উঠেছিল বিগত আরব্য রজনীতে, তার দুটো ক্ষীণ ডানা গজাবে। খুঁজতে হবে সেই স্বপ্নকুহুকিনীকে, যার শ্যাওলা সুবাস ম-ম করছিলো বালিশ জুড়ে। খুঁজতে হবে তাকে, যার তাম্বুল ঠোঁট হৃদয়- মিসিসিপিতে বিলীন হয়ে গেছে।

(৬)

অবশষে খুঁজে পাওয়া গেলো তাকে। এক সম্ভাবনাময় গোধূলিতে জলের রাজধানীতে দেখা গেলো তরল রমণীকে। যে ডাক প্রস্ফুটিত হয়েছিল রৌপ্য- তমসার নিবিড় ঘুমে, সে বৃতিময় হয়ে উঠলো সরোবরের বাসি হৃদয়ে। যে নারী বহুদিন অপেক্ষা করেছিল জলের নেপথ্যে, যার ঘর বাড়ি পরিজন কবেই ভেসে গেছে কোনো আধিদৈবিক বন্যায়, শুধু সে রয়ে গেছে। তার বিপুল সাম্রাজ্য জনহীন, তার অশেষ উপনিবেশ হারিয়ে যাওয়া পরীদের গন্ধে আকুল হয়ে থাকে। সেই নারী খুঁজে পেলো একটি মানুষ। একটি মানুষ, যার অনুসন্ধিৎসা সামীপ্য এঁকেছিল একটি প্রাণনিবিড় সরোবরের ঘাটে। মনে হয়েছিল, এই মানুষটি পারে তাকে মুক্তি দিতে। আর আমি, স্বপ্নে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকা স্পর্শরেখা ধরে ধরে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম সেই একাকিনীর কাছে। গোধূলির ধূসর মায়ায় সে আবির্ভূতা হলো। যেন একটি জানলা খুলে গেলো ধ্যানস্থ জলাশয়ের। আর তার শিক ধরে মীনকন্যা বলে উঠলো, হে সৌম্য, যে কাজল পরিয়েছো এই আলতামিরা নয়নে, তার তুলি ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে একটি চুম্বন এলো, আর পৃথিবী ভেসে গেলো আকস্মিক বৃষ্টিতে। যে বৃষ্টির আয়ু চুম্বনের মতো, তার স্খলনে আদিম বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিও প্রাণ পেয়ে বসে। বাঁশবনে ছোটাছুটি করে বাউল বাতাস, প্রাণীরা ভাবে এই বুঝি গ্রহণ আসবে। যে বাস্তব কল্পনার মতো, তার গোপনতা রক্ষা করতে আচমকা তমিস্রা নামে চরাচরে। জলের গভীরে হারিয়ে যাওয়া সিঁড়ি ধরে উঠে আসে সে নারী। এতো বাস্তবের স্পর্শে ন্যুব্জ হয়ে আসে তার চিবুক। তবু পাড়ে ফেলে যাওয়া কোনো নারকেল তেলের শিশি তার কাছে পৌঁছে গেলো। পৌঁছে গেলো শামুকের প্রতিনিধিরা যারা এ সত্য জানতো বহুদিন ধরেই। শুধু মানবিক ভাষা ছিলো না বলে জানাতে পারেনি কখনো কোনো আয়ত চোখের মানুষকে। আজ সেই লগ্ন এলো, মরুদেশের বুকে বর্ষার মতো। সিক্ত মাটিতে যেভাবে কলসীর দাগ জেগে থাকে, সেভাবে একটি স্পর্শ ঘনীভূত হলো নারীর সোঁদা কপোলে। ব্যাঙ ডাকলো খুব। কথা দিলাম, প্রতি রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে যায় উপাধানের সুরম্য কাননে, তখন দেখা হবে। জোনাকিখচিত আকাশগুলি সাক্ষী থাকবে সেই সময়হীন স্থানহীন কথোপকথনের।

(৭)

রাত নামলেই পথ উজ্জ্বল হয়ে যেত। যেন শ্বাপদরাও অবহিত ছিল এই অপার্থিব আলাপচারিতা সম্পর্কে। কখনো তিরতির বাতাসে কথা বলতো শাপলা পাতাগুলি, যেভাবে জল্পনারত কিশোরীরা ফিসফিস করে বন্ধ বাসরঘরের অদূরে। শাল্মলী ফুলগুলি হঠাৎ ঝরে পড়তো পায়ের কাছে। যেন সমস্ত প্রকৃতিই হঠাৎ প্রতিবেশী হয়ে গেছে। দোপাটি ফুলের বাগানে আলোলিকা শোনা যায়। পুকুরঘাটে অযত্নে ফেলে যাওয়া বাটি সাবানের গায়ে আলতাপাটির ছাপ কারো। এভাবে সাজিয়ে তুলেছো তুমি আয়নামহল, জলরাণী। তারপর এসেছো গভীর রাতের পাখি ডাকা প্রহরে।

সারারাত কথা হলো অনেক পুষ্করিণীর স্ফটিক আবহে। তোমার ঘর- বাড়ি, রাজমহল, নক্সাকাটা মেঝে, ইতিহাসবিদের কান পাতা খিলান, অমাবস্যার রাতে মৃগয়া অথবা অষ্টমীর রাতে তোপ দাগার গল্প। সেসব কবেই ফুরিয়ে গেছে, শুধু তুমি রয়ে গেছো কোনো এক আশ্চর্য সঞ্জীবনী ঘুমে। সব চলে গেলো আর তুমি এসে পৌঁছলে এই জলরাজ্যে। তোমার শিঞ্জিনী পা দুটি জুড়ে দিলো কেউ, শরীরে জন্ম নিলো শঙ্ক। আর আমিও হাইরোডের ধারে ঘটে যাওয়া বাস দুর্ঘটনায় কিভাবে টিকে গেলাম একা, সেই ইতিহাস তোমায় বলি। এভাবে রাতের পর রাত কেটে যায়। ভোরের আলো ফুটলে তুমি উদ্বায়ী হয়ে যাও, যেন সেই রাজকীয় ইতিহাসগুলি তোমায় চক্ষুষ্মান করতে চায় না সূর্যালোকে।

একদিন তোমার সাথে পাড়ি দিলাম তোমার সাম্রাজ্যে, ভাসমান বিছানা, আলুথালু বালিশ ভরে ছিল চুয়াচন্দন সুবাসে। আর এক আজন্ম নিস্তব্ধতা সেই রাজ্য জুড়ে, যেন একটি পিঁপড়ে হেঁটে গেলেও সেই শব্দব্রহ্ম পারমাণবিক বিস্ফোরণের মতো লাগবে। একটি সূর্য অস্ত যাচ্ছে পশ্চিমে আর একটি সূর্য উঠলো পূর্ব দিগন্তে। দুটি সূর্য পরস্পরকে নিমীলিত করতে চায়। আর সেই যুযুধান পৃথিবীতে দুটি ফুল হয়ে পড়ে রইলাম পাশাপাশি। সৈন্যদল চলে গেলে চুপিচুপি চোখ খুলে উঠে বসি। ভাবি এ কালবেলাও পেরিয়ে গেলো কোনোমতে।

"উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহৌরি।
ণিঅ ঘরনি ণামে সহজ সুন্দারী।।
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী।। "

(৮)

সেদিন রাতে ভাসছিলাম একসাথে তোমার জলসাম্রাজ্যের পৃষ্ঠদেশে। আকাশভরা তারা, আয়ত চোখের চাঁদ স্পর্শ করে যাচ্ছিলো বধ্যভূমির অনামিকা। ভাসতে ভাসতে কখনো দূরে সরে যাই। কখনো উপলব্ধি করি তোমার আঙুলের খিলানগুলি সরে গেছে এই ধ্বংসস্তূপ শরীরের বুক থেকে। আকাশ জুড়ে দেঁতো হাসি হাসছে কালপুরুষ। যেন এই মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষা ছিল তার। মনে হয় যেন আজন্মকালের এক ঘুম ছেয়ে আসছে আমার বোবা আকাশ জুড়ে। যেন প্রতিটি ঘুমের সিঁড়ি নামতে নামতে হারিয়ে যাচ্ছি একটি অনিশ্চিত অতলস্পর্শী শূন্যতায়। আর কালপুরুষ দখল করে ফেলেছে সমস্ত আকাশ। শিয়রে তুমি নেই লুব্ধকের মতো, মৎস্যকন্যা। তোমার ললাট জুড়ে লিখে রাখা অভিশাপের ভবিতব্যগুলি আমায় স্পর্শ করছে। এমতাবস্থায়, তুমি এলে। কোনো তিমির অতিক্রম করে মৃত্যুমুখী শেষ সোপানে তোমার দেখা পেলাম। শুনতে পেলাম পার্থিব কিছু পিছুটান। বাসনের গায়ে খড়- ছাইয়ের আওয়াজ, সকালের মোরগঝুঁটি ফুল , মাটি খুঁড়ে পেতে রাখা অস্থায়ী উনুন, অণু- বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া ছাগশিশুর ডাক।
ফিরে আসি নিকেতনে। মাচায় বাড়ছে লাউগাছ। আকর্ষ আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে ইলেকট্রিক খুঁটিকে। এভাবে সভ্যতা উদ্ভিন্নযৌবনা হয়ে ওঠে। মেঝেতে উবে যেতে থাকা জল দেখে ভয় হয়, কোনোদিন তুমিও

হারিয়ে যাবে। বাষ্পীয় হয়ে চলে যাবে দরজার তলার ফাঁক দিয়ে। কোনো বকযন্ত্রে তোমাকে আটকে রাখি, ওপাশে আকন্দ ফুলের ঝোপ বাড়তে থাকে। হয়ত লৌহপ্রকোষ্ঠ বাসরঘরের ছিদ্রান্বেষী সাপগুলি নির্মোক ত্যাগ করছে ওখানেই।

(৯)

বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে একটি বিরামহীন সেতুর বুকে শুয়ে আছি বুকতিল। কখনো উদক সকাল, কখনো স্টিলের থালায় শোকড়ির সাথে শুকিয়ে আসা তোমার আঙুল- নামগুলি। প্রতিটি রাত পেরিয়ে যখন সকাল আসে শিউলিপ্রপাতে, মনে হয় একটি কল্পনা- খোঁয়ারি অতিক্রম করে পা রাখি বাস্তব- মান্দাসে। তার নড়বড়ে দুপ্রান্ত , তার নিরুদ্দেশ মাঝি। হাঁড়িগুলিতে মাছ নেই। কাঠের পাটাতন আকণ্ঠ জলমগ্ন। অ্যালুমিনিয়াম বাক্সে জমানো নোটগুলি সংখ্যালঘু হয়ে এসেছে। ভিখিরিরা দ্বারে এসে ফিরে গেলো, যেন তারাও বুঝতে পেরেছে হতশ্রী হয়েছে পুরুষের নিকেতনখানি।

অনেক নির্ঘুম নিশি, ক্লান্ত অপাঙ্গ অথচ তার অপর প্রান্তে মধুপের ঘরবাড়ি। এভাবে প্রত্যেকটি রাত কেটে যায় মকরন্দের আধারে ইন্দ্রিয় নিমজ্জিত করতে করতে। ঋতু আসে যায়, অবহেলার আমগুলি পড়ে থাকে বাগানে যেভাবে ক্ষতস্থাণ জেগে থাকে মৃতজনে। গাঁয়ের বাজারেও আমাকে দেখতে পায়নি বহুদিন অনেকে। জনশ্রুতি রটে যায়, গভীর রাতে আমাকে দেখা গেছে অনেকবার একা। কখনো পেয়ারা গাছের নিচে আচ্ছন্ন অবস্থায়, কখনো সাঁকোর উপর নিদ্রামগ্ন অবস্থায় খুব ভোরে। চোখে সুখ অথচ আলুলায়িত চেতনার হাড়গুলি শুঁকে দেখে কুকুর।
রটে যায়, কোনো নতুন গভীর নেশায় পেয়ে বসেছে আমায়। সাইকেলে মন নেই, টায়ারগুলি হাওয়ার অভাবে কেদরে পড়ে আছে। ঘরময় ধুলো, কুলুঙ্গিতে কবেকার বাসি হয়ে যাওয়া সলতে। কিছুতে মন নেই আমার , শুধু একটি কনীনিকায় ডুবে আছি। শুধু জলকন্যার সাথে শুয়ে শুয়ে প্রতিটি রাত কেটে যায় সরোবরে। কথা নেই, তবুও, একটি ফুলের উপকণ্ঠে বসে থাকি। দেখি কিভাবে গর্ভকেশরে নিনাদ স্পর্শ করে আদি এক শঙ্খধ্বনির। ঘর তা বোঝে না, তার উপবৃদ্ধি বাড়ে নাপিতের অভাবে। বুঝতে পারি, কড়িকাঠের বুকেও দড়ি জন্মাচ্ছে, অথবা ফ্যানের গায়ে জন্মাচ্ছে শাড়ি। নিশিযাপন আমার দিনগুলিকে ঠেলে দিচ্ছে এক অজানা আত্মহত্যার দিকে।

(১০)

সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। নক্ষত্রহীনতা আকাশকে প্রতিসম করে তুলেছিল। যে নক্ষত্রগুলি অজ্ঞাতবাসে ছিল, তারা নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলো স্বয়ংপ্রভ হবার কথা ভুলে। শুষ্ক ছিল বিনুনী তোমার, তার সর্পিল গতিপথে জ্যোৎস্না হাঁটছিলো শম্বুকগতিতে।
জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কী? এই তোলপাড় করা রাতগুলির পৃথিবী আর ওই শান্ত খড়ের চালের পৃথিবী কি কখনো এক হবে ? অভিসার কি ঘর পাবে? অথবা আত্মমগ্ন অবস্থায় শিউরে উঠবে বাঁশবাগানের কোনো অকাল মর্মরে?
মৎস্যকন্যা বললো, যে তরল সময় বয়ে গেছে আবহমান সময় জুড়ে, তার কি ইত্যবসর আছে?
আমি বললাম, যদি একাকিনী নারীর শিয়র সাজিয়ে দেওয়ার আতর জন্ম নেয় পুরুষের হৃতগৌরব সাম্রাজ্যে, তবে কি নকুলও জন্ম নেবে না এ নির্মোক- পৃথিবীতে ?
মৎস্যকন্যা বললো, হয়তো বীতংস সবই। এ পার্বত্য দিনকাল চলে গেলে পড়ে থাকবে একটি পলিময় মৃতবৎসা নদী। কেউ আছে , যার অদৃশ্য আঙুলগুলি নিমেষেই শেষ করে দিতে পারে সমস্ত লৌকিকতা।
আমি বললাম, তবু, যে বিড়াল মাছের কাঁটা মুখে তুলে নেয় পৌষালী বিকেলে , সে হলাহল ভাবে না। যে আঁধারের মায়া তোমায় অন্ধ করেছে , তার বিপ্রতীপে রেখে এসেছি তুলসীতলা। দেখবে না একটি পিলসুজে

কত রাত্রির মৃতদেহ পড়ে থাকে ? ঘর এক দীপ্তিমান চেতনা, তার বাসি হয়ে আসা মালার ছবিও রাকা হয়ে ফুটে থাকে ভোরের আকাশে। এসো, স্পর্শ করি দরজাকে। অর্গলে বারণ আঁকি খুব।

(১১)

দীর্ঘদিনের শ্যাওলা অভ্যেস শরীর থেকে মুছে বাস্তবের মাটিতে পা রাখে মৎস্যকন্যা। যে আঙুলগুলি দীর্ঘদিন জলের গহবরে বিদ্যমান ছিল, তাদের ঘাসের স্পর্শ অচেনা লাগে। মনে হয় একটি পৃথিবী এতো কাছে থেকেও অধরা থেকেছে কোনো প্রাচীন অভিশাপের বশে। যে কলসী ভেসে থাকে বহুদিন জলে, অথচ মেঝেই ছিল তার চারণভূমি। অভিশাপ কবেই ফুরিয়ে গেছে, শুধু কেউ আসেনি তাকে সে কথা মনে করিয়ে দিতে। কেউ বোঝায়নি যে প্রত্যেক আপদকালেরই তিরোধান দিবস থাকে, আসে অনুকম্পা। শীতল জলকণারা নিমেষেই মিশে যায় মৃত্তিকার সর্বংসহা দেহলীতে।

ভোর হচ্ছে, আর এই আদিম নারীকে নিয়ে আমি ফিরে যাচ্ছি ঘরে। রূপকথার মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছি বাস্তবে। অংশু স্পর্শ করে যায় তার ফুলেল শরীর। তবুও অসম্ভব এক বিশ্বাসে সে চোখ রাখে আমার চোখে। অবাক হই কিভাবে ভূমিময় নারীত্ব প্রতীয়মান থাকে জলের নিগড়েও। অদূরেই দেখা যায় কিভাবে ন্যুব্জ কলাগাছটি অনূঢ়াকে আয়নাময় করে তোলে। শিউরে ওঠে তার পার্শ্বরেখা। বহু চেনা রাস্তাগুলিও অচেনা লাগে আজ। রাস্তা চিরনতুন, শুধু পথিকের অভ্যেসে তার গায়ে মরচে পড়ে। পথের নুড়িগুলি সচকিত হয়ে ওঠে এই অনাম্নী গন্ধের রমণীর স্পর্শে। বোঝে, সময় হয়েছে পাশ ফেরার। চাঁদের অন্ধকার দিকটি আজ দেখা যাবে আকাশে এই আশায় দূরবীন চোখে জেগে থাকে মানুষ রাতভোর। হয়তো শিশিরও উদ্বেল হয়ে উঠবে কখন শৌভিক এসে তাদের ক্লিন্ন জামাগুলি পাল্টে দেবে। আলনায় ঝুলতে থাকে আঁশের অতীতগুলি। মৎস্যকন্যা অপাঙ্গে কাজল মেখে নেয় পালঙ্কের মলমাস পেরোলো বলে।

====

পরিচিতিচিত্রঃ কবি

অর্ঘ্যদীপ রায়- এর জন্ম ১৯৮৯। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রনিক্স অ্যাণ্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক, আই- আই- টি খড়্গপুর থেকে স্নাতকোত্তর এবং আইআইটি বম্বে থেকে পি- এইচ- ডি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয়- আর্বানা শ্যাম্পেন- এ পোস্টডক্টরাল গবেষক হিসেবে দু বছর কাটানোর পর বর্তমানে আইআইটি গুয়াহাটিতে সহকারী অধ্যাপক। প্রকাশিত বই ‘একটি জ্যোতির্ময় শিশু আসে’ (২০১৭)।